Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিশাত তাসনিম হিয়া

রোলঃ 23090120270


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিশাত তাসনিম হিয়া

রোলঃ 23090120270

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নিশাত তাসনিম হিয়া, আইডিঃ 23090120270 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

**নিশাত তাসনিম হিয়া**

আইডিঃ 23090120270

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র


ভূমিকা ........ 6

নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ........ 7

কুরআনের আলোকে নারী শিক্ষা ........ 12

হাদীসের আলোকে নারী শিক্ষা ........ 13

যুগে যুগে নারী শিক্ষার স্বরূপ ........ 15

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে নারী শিক্ষা ........ 16

সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা ........ 19

তাবেয়ীদের যুগে নারী শিক্ষা ........ 21

উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারী শিক্ষা ........ 24

জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান ........ 25

হাদীসচর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান ........ 34

সহ-শিক্ষা ........ 38

পশ্চিমা সংস্কৃতি ও তাদের অনুসারীরা শিক্ষাকে যে পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে ........ 39

পশ্চিমাদের দাবী, যুক্তি ও তার জবাব ........ 40

বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় ........ 45

নারীর নিরাপদ শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ........ 46

চ্যালেঞ্জসমূহ ও তার মোকাবিলা ........ 48

উপসংহার ........ 51

রেফারেন্সসমূহ ........ 53

# ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। জ্ঞানার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মৌলিক ও অপরিহার্য কর্তব্য। একটি সুন্দর, সুষ্ঠ ও সমৃদ্ধ জীবন গড়তে যে উপাদানগুলো প্রয়োজন, ইসলাম সেগুলোর সবই পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতিকে সেই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। কুরআন নাযিলের সূচনাই হয়েছে "اِقْرَأْ" (ইক্‌র) অর্থাৎ "পড়ো" [সূরা আলাক: ১]—এই শব্দ দিয়ে। জ্ঞানার্জনের আহ্বান দিয়েই আল্লাহ তায়ালা ওহীর যাত্রা শুরু করেছেন, যা প্রমাণ করে ইসলামে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা কত উচ্চে।

এখানে 'পড়ো' নির্দেশটি কেবল পুরুষদের জন্য নয়, বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য নেই। কুরআনের বহু আয়াতে আমরা দেখি, পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করা হলেও তা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতিই সমানভাবে নির্দেশিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

অর্থঃ "আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়।" [সূরা আন-নূর: ৫৬]

বর্তমান সময়ে "নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান" বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, পশ্চিমা চিন্তাবিদদের একাংশ ইসলাম সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে দিয়েছে—তারা দাবি করে, ইসলাম নাকি নারীকে পিছিয়ে রেখেছে, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু বাস্তবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেখা যায়, ইসলামই প্রথম নারীকে সম্মান, মর্যাদা এবং জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারীকে শুধু শিক্ষালাভে উৎসাহিত করেনি, বরং জ্ঞানার্জনকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থঃ "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।" [১]

সুতরাং, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধা সৃষ্টি করেনি। বরং নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে পড়তে বলেছে, জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে।

# নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দেয় এবং উৎসাহ প্রদান করে। কুরআন-হাদিসে এমন কোনো উক্তি নেই যা নারীর শিক্ষা গ্রহণকে নিষিদ্ধ করে কিংবা নিরুৎসাহিত করে। ইসলামের ইতিহাসে অনেক আলিমা, মুহাদ্দিসা, ফকিহা ও খ্যাতনামা নারীদের দৃষ্টান্ত আছে। যেই সাতজন মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের প্রজ্ঞা গণমানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাদের একজন হলেন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এমনকি ইসলামি ইতিহাসে নারীরা ফতোয়া প্রদানের খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইসলামে নারীর শিক্ষা কোনো গৌণ বিষয় নয়; বরং এটি একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এজন্য কেউ নারীর শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করতে পারে না। এমনকি কোনো নারী যদি উচ্চশিক্ষাও অর্জন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া বৈধ হবে না। তবে সেই শিক্ষা, তার পরিবেশ ও উদ্দেশ্য অবশ্যই নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া যাবে না। ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালা ও চাহিদার পরিপন্থি হওয়া যাবে না।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এটাই যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাউকেই এই শিক্ষা তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন করে না। তাদের আদর্শ পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা এখানে নেই।

বিশেষ করে সমাজে নারীশিক্ষার যেই আস্ফালন, তার পুরো প্রজেক্টই পশ্চিমাবান্ধব। এই শিক্ষা প্রজেক্টের অন্যতম এজেন্ডা হলো, নারীকে কেবল একজন উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে আমদানি করা। প্রচলিত নারীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করা, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান হওয়ার এক অপ্রাকৃতিক ও ঘৃণ্য প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেওয়া।

উপনিবেশ আমলে যখন মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন শায়খ মুস্তফা আস সবারি রহিমাহুল্লাহ কওলি ফিল মারআহ ওয়া মুকারানাতুহু বি আকওয়ালি মুকাল্লিদাতিল গারবি নামক গ্রন্থ লেখেন। এই বইয়ে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি নারীদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত তাদের প্রধান ও স্বভাবজাত দায়িত্ব পালন। অর্থাৎ পরিবার পরিচালনা, সন্তান প্রতিপালন ও তাদের চরিত্র গঠন। এবং তাদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, সুস্থতা ও অর্থনীতির ওপর। সব কাজে ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষা কর্মসূচি হওয়া উচিত নয়। কারণ এটা সম্ভবও না, কল্যাণকরও না। আর নারী-পুরুষের সমতার যেই দাবি, এটা কখনোই সম্ভব নয়। একজন

পুরুষের জন্য যেসব বিষয় উপযুক্ত, তার সবগুলো একজন নারীর জন্য উপযুক্ত হবে না। একই কথা বিপরীত ক্ষেত্রেও।’

এজন্য নারী-পুরুষের শিক্ষা কর্মসূচি এক হওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, সমাজের সদস্যদের স্ব স্ব দায়িত্বে দায়িত্ববান করে তোলা। দীনের বুনিয়াদি শিক্ষার পর স্ত্রী ও মা হিসেবে একজন নারীর শিক্ষায় প্রথম অগ্রাধিকার পাবে এই সংক্রান্ত শিক্ষা অর্জন করা। এজন্য শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ি রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, বিশেষভাবে পরিবার পরিচালনা-সংক্রান্ত বিদ্যা মেয়েদের পাঠ্যসূচিতে বেশি পরিমাণ থাকা উচিত। যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা অর্জন সহজ হয়।

পাশাপাশি মেধা অনুপাতে এবং দীন, উম্মাহ ও সমাজের প্রয়োজনে তার ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন শাস্ত্রেও একজন নারী ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে। নারীর শিক্ষা কর্মসূচি এমন হতে হবে, যা তাকে আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসেবে গড়ে তুলবে। তাকে পুরুষের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার বাসনায় উন্মাদ করবে না। তাকে পরিবার থেকে বিমুখ করে বহির্মুখী করে তুলবে না। তাকে এমন কোনো পেশা কিংবা পরিবেশে ঠেলে দেবে না, যেখানে তার নারীত্ব ও মর্যাদা মারাত্মকভাবে শোষিত হয়, কিন্তু সেটা সে অনুভবও করতে পারে না। তাকে মাতৃত্বের পরিচয় ছাপিয়ে কেবলই একটা উৎপাদক যন্ত্র হওয়ার লিপ্সায় অন্ধ করে তুলবে না। [২]

ইসলাম নারীকে পার্থিব, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা লাভে শুধু অনুমতিই দেয় নি, পুরূষদের মতো নারীর শিক্ষা অর্জনকে প্রয়োজন মনে করা হয়েছে ইসলামে। কেননা নারী ‘মা’ হয়। আর একজন মায়ের বড় দায়িত্ব সন্তান লালন-পালন, তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা তারবিয়াত দেয়া। মা শিক্ষিত না হলে সন্তান সঠিক তারবিয়াত পাবেনা। একজন নারী হয় ঘরের রাণী, ঘর সামলাতে হয় তাকে, এই জিম্মাদারী সুষ্ঠ সুন্দরভাবে পালন করতে অবশ্যই জ্ঞান প্রয়োজন, সঠিক জ্ঞান না থাকলে ঘরের জিম্মাদারী এলোমেলো হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই নারীর শিক্ষার্জন জরুরী। একারণেই ইসলামে মূল শিক্ষার্জনে নারী-পুরূষে কোনো পার্থক্য করা হয় না। তবে শিক্ষার ধরনে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর শিক্ষা হবে সেসব বিষয়ে যা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

নারীর কর্মপরিধি অনুযায়ী তার ইসলামী জ্ঞানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। হাদীসে এসেছে, ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল (রক্ষণাবেক্ষণকারী), আর তোমাদের দায়িত্ব অনুযায়ী জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম (রাষ্ট্রের নেতা, কর্মকর্তা ও মসজিদের ইমাম) একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার

স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকে তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।[৩]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে নারী যত বড় দায়িত্বশীল, তার ইসলামী জ্ঞানের পরিধিও ততবেশী প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবে যে সব নারীরা নিজ গৃহের দায়িত্বশীলা, তাকে গৃহ পরিচালনা, সন্তান সন্ততি, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও অধিকার, প্রাত্যহিক জীবনে চলার জন্য যে সব অর্পিত ইবাদত (যেমন: পবিত্রতা, নামায, রোযা প্রভৃতি) আছে ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা ফরয। আর কোনো নারী যদি চাকুরী বা ব্যবসা করে, তবে তাকে উপরোক্ত জ্ঞানের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আবার কেউ যদি সমাজের দায়িত্বশীল হন, তবে তার জন্য জনগণের অধিকার ও ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জ্ঞান থাকাও ফরয।[৪]

যেহেতু নারীর কর্মক্ষেত্র হচ্ছে ঘর, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা তাকে এক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী করে গড়ে তুলবে। এছাড়া তার এমন শিক্ষারও প্রয়োজন যা একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এরপর কোনো নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত এই যে, কোনো অবস্থায়ই সে শরী'আতের সীমা অতিক্রম করবে না। শরী'আতের গন্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী হতে হবে।[৫]

গোটা মানব জাতিকে ধ্বংস হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ("প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয")- এই বানী সে যুগে এমন নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর কোনো রকম ইয্যত-সম্মান ছিল না। তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর হতে বহিষ্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ অশেষ রহমত করে তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার মাধ্যমে শুধু পুরুষদেরকেই নয়, বরং নারীদেরকেও সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূঁড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বর্বরতার যুগে ক্রীতদাস-দাসীদের মান-ইয্যত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তারাও এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাঁদের নিকট হতে দীনি শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। [৬]

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আ'নহুম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী রহঃ এর মত মহাপুরুষগণের

আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আ'নহুন্নার মত মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনি-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎ রূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।[৭]

সাহাবীরা যখনই কোন মাসআ'লার ব্যাপারে সন্দিহান হতেন বা সমস্যায় পড়তেন তখনই তারা পর্দার আড়াল থেকে হযরত আয়শা (রা.) এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন এবং সঠিক সমাধান পেয়ে যেতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, পর্দার সাথে মহিলাদের জন্য শিক্ষকতা করা বা মহিলাদের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের কোনো বাধা নেই। আর পর্দার বিধান নারীকে আবদ্ধ করার জন্য নয়, নারীকে শিক্ষা বিমুখ রাখার জন্যও নয় বরং নারীর সম্ভ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তা দানের জন্যই পর্দার বিধান রাখা হয়েছে। শিক্ষাও যেমন নারীর জন্য জরুরী ঠিক পর্দাও নারীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জরুরী।

সাহাবা এবং তাবে'য়ীদের যুগে বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীয়াগণের ইলমের যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আ'নহা-এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে'য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।''[৮]

এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ ''এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।'' শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী।

অমিয়া বাগদাদী নাম্নী জনৈকা মহিলা মদীনাতে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট ই'লমে হাদীস এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)- এর নিকট ই'লমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ এর বিশদ জ্ঞান অর্জন করে

দীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। ''মাদখাল'' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়।[৯]

আমাদের দেশের নারী সমাজ ইসলামী শিক্ষা থেকে অনেকটা বঞ্চিত। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন একদল আদর্শ যুবক তৈরি করা, একদল আদর্শ যুবক তৈরি করতে হলে দরকার একদল আদর্শ শিশু তৈরি করা। আর একদল আদর্শ শিশু তৈরি করতে হলে আগে তৈরি করতে হবে একদল ইসলামী শিক্ষা সম্পন্ন আদর্শবতী মা। একজন শিক্ষিতা ও আদর্শবতী ''মা'' ই পারেন একটি শিক্ষিত ও আদর্শ সমাজ উপহার দিতে।

কিন্তু আমাদের দেশের মায়েরা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে কতটুকু সুযোগ-সুবিধা পায়? হাদীসে এসেছে, "প্রত্যেক শিশু ইসলামের (মুসলিম হয়ে) উপর জন্ম গ্রহণ করে, অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, নাসারা বা মুর্তিপূজক বানায়।" [১০]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিশুদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মা-বাবার কতটুকু ভূমিকা রয়েছে। পারিবারিকভাবে শিশুকে ইসলামের আদর্শ ছোটবেলায় শিক্ষা দিলে সে বড় হয়ে এ আদর্শই প্রতিপালন করবে। তাছাড়া ইসলামের বিধিবিধান যথাযথভাবে বুঝা, তার নিজের ও অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, বিশ্ববাসীর প্রতি ইতিবাচক চিন্তা চেতনা, সৃজনশীল কিছু আবিষ্কার করা, পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা সর্বোপরি নিজের সংসার উন্নতিকল্পে সর্বক্ষেত্রে নারীর ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই।[১১]

# কুরআনের আলোকে নারী শিক্ষা

ইসলাম নারীকে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পুরূষের সাথে পার্থক্য করেনি। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সমভাবে সকল পাঠককেই চিন্তা-গবেষণা করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَيۡكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوۡۤا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

অর্থঃ আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা স্বদঃ২৯]

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন ইবাদতের জন্য। জ্ঞান লাভ ছাড়া ইবাদত করা সম্ভব না। কোনো আমল কিভাবে করতে হবে, এর মাহাত্ম,ফজীলত কেমন-তা জানার জন্য, আমলের প্রতি আগ্রহ তৈরি হওয়ার জন্য বা আমলে পাবন্দি করার জন্য এগুলা জানা আবশ্যক। জ্ঞানার্জন ছাড়া তা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহকে ভয় করা, তাওয়াক্কুল করা তো জানা ছাড়া সম্ভব না। যারা জ্ঞানী তারাই জানবে কিভাবে আল্লাহকে ভয় করে তার আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হয়।আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّمَا يَخۡشَى اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓؤُا

অর্থঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই কেবল তাঁকে ভয় করে। [সূরা ফাতিরঃ২৮]

আল্লাহকে ভয় তো শুধু পুরূষ করবে না, নারী-পুরূষ উভয়কেই আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সকল কাজ করতে হবে। কারণ হাশরের ময়দানে বিচার শুধু পুরূষের হবে না, নারীকেও সমানভাবে জবাবদিহী করতে হবে। তাই সফল হওয়ার জন্য উভয়কেই জ্ঞানার্জন করতে হবে।

নবীস্ত্রীগণকে সরাসরি উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلٰى فِىۡ بُيُوۡتِكُنَّ مِنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالۡحِكۡمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيۡفًا خَبِيۡرًا

অর্থঃ আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। [সূরা আহযাবঃ৩৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى الَّذِيۡنَ يَعۡلَمُوۡنَ وَالَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ‌ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

অর্থঃ বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা যূমারঃ০৯]

আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ নিয়ে চিন্তা-অনুধাবন করার, বিবেকবান হওয়ার, বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা এভাবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বারবার দেয়া হয়েছে যা নারী পুরুষকে আলাদাভাবে দেয়া হয়নি।

# হাদীসের আলোকে নারী শিক্ষা

হাদীসেও আমরা নারী শিক্ষার প্রতিফলন দেখতে পাই। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে পুরূষ সাহাবীগণ যেমন ইসলামের মৌলিক ও পারিপার্শ্বিক জ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধের জ্ঞান নিতেন, নারী সাহাবিয়াগণও তদ্রূপ করতেন । এমনকি নারীদের জন্য আলাদা সময়ও নির্ধারণ করা হয়েছিলো যাতে তারা সে সময়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে থেকে তালিম নিতে পারেন।

শুধু শিক্ষিতই নয়, নারীরা শিক্ষিকাও হতে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকা রাদীয়াল্লাহু আ'নহা এক্ষেত্রে অনন্য। তিনি শুধু নারীদের-ই নন, পুরূষদেরও শিক্ষিকা ছিলেন। বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তার নিকট থেকে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ এর শিক্ষা নিতেন। এছাড়াও উম্মে সালামা, উম্মে হাবীবা, হাফসা, আসমা বিনতে আবু বকর, মায়মুনা, উম্মে হানী রাদিয়াল্লহু আ'নহুন্না প্রমূখ সাহাবিয়া গণও শিক্ষা অর্জনে এবং শিক্ষা দানে ছিলেন অগ্রগণ্য।

শুধু সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ হাদীসে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যার নিকট কাোনা দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং এরপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে মর্যাদা দান করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।"[১২]

এভাবে শুধু আযাদ মহিলাই নয় ঘরের দাসী বাদীদেরও শিক্ষার আলো থেকে তিনি বঞ্চিত করেননি। নারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ .فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ الله واثنتين ؟ قَالَ :واثنتين

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, উত্তম চালচলন ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে সাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কেউ যদি দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দু'জনের জন্য এরূপ করলেও হবে।[১৩]

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীগণও নিঃসংকোচে জ্ঞান অর্জন করতেন। এভাবে সাহাবায়ে

কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলা মুফতী। উমর, আলী, যায়েদ ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আ'নহুম প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় আয়েশা সিদ্দীকা, উম্মে সালমা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু আ'নহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীয়াগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন। তিরমিযী শরীফে আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আ'নহুর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আ'নহার নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।" [১৪]

# যুগে যুগে নারী শিক্ষার স্বরূপ

সমাজের এক অংশকে বাদ দিয়ে অন্য অংশ কোনো দিনই উন্নত হতে পারে না এ সত্য মানুষ অনুধাবন করতে শুরু করেছে। সমাজসেবা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী জাতির সার্থকতা-আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরাট বিজয়।[১৫]

ব্যক্তি সত্তার পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন। [১৬]

শিক্ষা গ্রহণ সকল নরনারীর অবশ্যই কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগে স্ত্রী পুরুষ একই মসজিদে নামায পড়তেন, তালিম নিতেন। তখনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হতো। অথচ অজ্ঞতার যুগে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হত। তাই লেখাপড়া শেখানো ছিল কল্পনাতীত।

# নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে নারী শিক্ষা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরয ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। মহিলাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য তিনি একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের সময় দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।[১৭]

সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে তিনি নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে যে সমস্ত জ্ঞান চর্চার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো মহিলারা অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তার উপকার লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব মজলিসে তাদের উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য। অনেক মহিলা ছিলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। কোনো সময়ে যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা তার কথা ঠিকমত শুনতে পাননি, তা হলে তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন।[১৮] আল-কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষভাবে ঘরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের মহিলারা দ্বীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরী দীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে, তা হলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভের সুযোগ মহিলাদের দিতে হবে, এই হচ্ছে ইসলামী আইনের বিধান। দীনি জ্ঞান লাভের জন্য নারীকে সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা হলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধমে নব-নব সত্য তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী সমাজের কর্তব্য।[১৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেননি।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেনঃ

وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ۝

অর্থঃ যারা জ্ঞানী ও বিদ্যান তারা বলেন, আমরা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান এনেছি এবং কেবল বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই (কোনো জিনিস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।''[সূরা আলে ইমরান : ৭]

সুতরাং আল-কুরআনকে বুঝবার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন করতে হবে। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পুরুষের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষার উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন।[২০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্খা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে,জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না। আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আ'নহা বলেনঃ

نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين

''আনসারী মহিলারা কতই না ভাল! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।''[২১]

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আ'নহা-এর নিম্নের উক্তি হতেই তা বোঝা যায়,

''নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্থ না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।''[২২]

অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের উত্তম শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও (অর্থাৎ উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করো)।' [২৩]

নারী শিক্ষার গুরুত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এক হাদিসে। একবার এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার হাদিস তো শুধু পুরুষরা শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শেখাবেন।'

তিনি বলেন, 'তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক জায়গায় একত্র হবে।' সে মোতাবেক তারা একত্র হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দেন। [২৪]

আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একবার আমি হাফসা (রা.)-এর কাছে ছিলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, 'তুমি কি ওকে (হাফসাকে) যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, সেভাবে পিঁপড়া (পোকা) কামড়ের ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দেবে না?' [২৫]

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল-জুহানিয়া রাদিয়াল্লাহু আ'নহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেনঃ

كنت اسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا في موخر النساء.

"জুমআ'র দিনে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।"[২৬]

হারিসা ইবনু নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেনঃ

ما حفظت "ق" إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم

"আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুমআ'র খুতবাতে এটি পড়তেন।"[২৭]

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোনো সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আ'নহু এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

«فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة»

"তিনি মনে করলেন যে, তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।"[২৮]

মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আ'নহু বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"[২৯]

# সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। একইভাবে তাঁরা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন তাতেও পুরুষদের সাথে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকত। আয়েযা নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আ'নহু-এর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন,

''আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আ'নহু-কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্যে থেকে যেই ফিতনার যুগের মুখোমুখী হবে সে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।''[৩০]

ফলে পূর্বে যে নারীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল এখন তারা তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যাদের কোনো অস্তিত্বই অনুভূত হতো না, এখন তারা জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আ'নহা-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আ'নহু বলেছেন,

''আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখি নি। ।[৩১]

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্য বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আ'নহা -এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।। [৩২]

মূসা ইবন্ তালহা বলেনঃ

''আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আ'নহা-এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখি নি।''[৩৩]

লোকেরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আ'নহা-এর কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা বিষয়ক অধিক জ্ঞান দেখে বিস্মিত হতো। ইবনে আবী মূলায়কা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব ও বাগ্মীতা দেখে চমৎকৃত হই না। কারণ আপনি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর কন্যা। আর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বাগ্মীতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কিভাবে শিখেছেন? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু

‘আনহা বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করতো। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[৩৪]
ফারায়েযের অংক শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[৩৫]
‘আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। ইবনে ইমাদ হাম্বলী নিম্নোক্ত ভাষায় তার কথা উল্লেখ করেছেনঃ
‘‘আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান আনসারী বিজ্ঞ ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। অতএব, তাঁর নিকট থেকে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত স্মৃতিশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সর্বদা গৃহীত হতো।[৩৬]
ইবন্ হিব্বান (র.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ‘‘তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।’’[৩৭]

# তাবেয়ীদের যুগে নারী শিক্ষা

তাবেয়ীদের যুগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ কাসিম ইবনু মুহাম্মদ রহঃ ইমাম যুহরী রহঃ কে বললেনঃ আমি তোমার মধ্যে জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেব না? যুহরী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, ‘আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের মজলিস কখনো ছেড়ে থেকো না। কারণ, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত। অতএব, তিনি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী। ইমাম যুহরী (র.) বললেন, তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি ‘আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের খিদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।[৩৮]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

‘‘উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা পরিপক্ক বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।’’[৩৯]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার (র.) বলেনঃ

‘‘তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।’’[৪০]

আবূ রাফে‘ সায়িগ (র.) বলেনঃ

كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت أبي سلمة.

‘‘যখনই আমি ফিকহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোনো মহিলার কথা স্মরণ করি, তখনই যায়নাব বিনতে আবূ সালামার কথা মনে পড়ে যায়।’’[৪১]

উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতই যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত দ্বীনের প্রচার ও ওয়াজ নসীহত করতেন।’’[৪২]

উম্মূল মু’মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন:

كانت عاقلة من عقلاء النساء

‘‘তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারিণী মহিলাদের একজন।’’[৪৩]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর স্ত্রী উম্মুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (র.) তাঁর আমলকে সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة

‘‘উম্মুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা একজন ফকীহ্ মহিলা ছিলেন। তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন। তাঁর এই আমল দলীল হিসেবে গণ্য।’’[৪৪]

“তিনি বিবেক-বুদ্ধি, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারিণী মহিলাদের মধ্যে গণ্য হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার এবং মুত্তাকী।”[৪৫]

“তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাই একমত।”[৪৬]

ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। একটি ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত উমর এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর সাথে বিতর্ক চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন,

كانت من المهاجرات الأول ذات عقل وافر وكمال.

“তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারিণীদের একজন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী ছিলেন।”[৪৭]

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী। হাফিয ইবনে হাজার (র.) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

“তাঁর মর্যাদা এবং গুণাবলী অনেক এবং সর্বজনবিদিত।”[৪৮]

তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন:

كانت من فاضلات الصحابيات .

“তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন।”[৪৯]

উম্মে আতিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন:

وهي من فاضلات الصحابيات والغازيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“তিনি উচ্চ মর্যাদা ও জ্ঞানের অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছেন।”[৫০]

হাফসা বিনতে সিরীন উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। বার বছর বয়সেই তিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন। তিনি বসরার বাসিন্দা ছিলেন। বসরার বিখ্যাত কাযী ও ফকীহ্ ইয়াস ইবনু মু‘আবিয়া তাঁর সম্পর্কে বলেন,

ما أدركت أحدا أفضِّلُ على حفصة.

“আমি এমন কোনো লোক দেখি নি, যাকে হাফসা বিনতে সিরীনের উপর মর্যাদা দিতে পারি।”[৫১]

তাবিয়ীদের ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর এক ছাত্রের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরদিনই তিনি তার উস্তাদ ইমাম সাঈদের মজলিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ইমাম সাঈদের কন্যা বললেন,

اجلس أعلمك علم سعيد.

''আপনি বসুন। ইমাম সাঈদ আপনাকে যা শেখাবেন তা আমি আপনাকে শিখিয়ে দিব।''[৫২]

ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট তাঁর ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও কোনো ভুল করে ফেললে ইমাম সাহেবের কন্যা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। নিজের কন্যা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর এতটা আস্থা ছিল যে, দরজায় তাঁর করাঘাত শুনলেই তিনি ছাত্রদের বলতেন:

ارجع فالغلط معك.

''তুমি আবার পড়। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।''[৫৩]

একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একটি মাসআলা বর্ণনা করলেন। তখন উম্মে ইয়া'কুব নাম্নী বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেনঃ''আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসআলা বর্ণনা করলেন তা কোথাও পাইনি।''[৫৪]

এভাবে নারীরা এত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন যে, তারা বড় বড় জ্ঞানীদের ভুল ও ধরতেন।

# উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারী শিক্ষা

উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করা হতো। মুসায়েব এর স্ত্রী আয়েশা বিনতে সালেহ জোতির্বিদ্যা ও আরবের ইতিহাস সম্পর্কে এতখানি জ্ঞান লাভ করেন যে, একবার হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক তার জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সাবিনা বিনতে হুসাইন কবিতা ও সাহিত্যের এক উঁচু দরের সমালোচক ছিলেন যে, ফারাযদাকের মত কবিও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ানের কন্যা এবং ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের জ্ঞান প্রীতির কারণে তাঁদের বাড়িতে জ্ঞানী গুনী, কবি, সাহিত্যিক এবং ফকীহের আনাগোণা লেগেই থাকতো। আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে নারীগণ সমাজে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীদের প্রভূত প্রভাব ছিল। আবুল আব্বাস আস্ সাফফাহ এর স্ত্রী উম্মে সালমা, মাহদী মহিয়সী খায়জুরান, মাহদীর কন্যা উলাইয়া, হারুন-অর-রশীদের মহিয়সী জুবায়দা প্রমুখ নারী রাজকার্যে যথেষ্ট কর্তৃত্ব খাটাতেন। হারুনের মহিয়সী জুবায়দা উচ্চ গুণ সম্পন্না কবি ছিলেন। মামুনের মহিয়সী বুরান ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। আব্বাসীয় আমলে ছেলেমেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষা দানের দায়িত্ব জননীদের উপর ন্যস্ত ছিল। মহিলাগণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন।[৫৫]

# জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান

জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। উম্মূল মু'মিনীন, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ইসলামী জ্ঞানে ছিলেন অদ্বিতীয়া। এমনকি প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। উরওয়া বলেন, তাঁর মত অধিক কবিতা মুখস্থকারী আমি আরবে আর কাউকে দেখিনি। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে দ্বিতীয়া। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০।[৫৬]

তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'আসমাউর রিজাল' নামক গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।[৫৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা শিফা রাদীয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন।[৫৮] বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন।[৫৯] তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন।[৬০] তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, ''আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম্ লাভ করেছি।''[৬১]

অপর একজন আয়েশা যিনি সা'দের কন্যা ছিলেন, তিনি তার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।[৬২]

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত পিতা-মাতা ও স্বামীর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই- ''তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সঙ্গে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আদেশ কর।''[৬৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[৬৪] মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের [৬৫] পর তার অনুসারীগণ, ইসলামের খলিফাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মাহাত্ম প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরাণ্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাদের কর্তব্য পালনে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[৬৬]

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।[৬৭]

রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাদের মধ্যে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তার সিদ্ধান্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর সিদ্ধান্তকে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অনুমোদন করতেন। তিনি মহিলা বিষয়ক কোনো কোনো সরকারি কাজের দায়িত্ব শিফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে দিতেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-দের তুলনায় অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।[৬৮]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন[৬৯]। আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবিয়াগণ বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।[৭০]

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।[৭১]

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা'দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীমের দারস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহল বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সলিমা, উম্মে আয়মান, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ যথাক্রমে পূণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা একত্রিত করলে কয়েকখান সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যশস্বী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অনন্য ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে কুলসুম বিনতে উক্‌বা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, করীমা বিনতে আল্-মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ভাল লেখাপড়া জানতেন এবং তারা গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন।[৭২]

মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্য চর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাকজমকের সাথে কবিতার মজলিস বসতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তার সুযোগ্য কন্যা উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, উমামা, মুরদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়ান, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনাস, উম্মে আয়মান, করিলা, আবদারিয়া, কসবা বিনতে রাফে, মায়মূনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর মত প্রতিভাবান মহিলা কবি সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তার কবিতা

পুস্তকাকারে ছাপানো হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিদূষী কবি, ঐতিহাসিক ও একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৭৩]

মুসলিম নারী ও পুরুষগণ উভয়েই সাধারণ শিক্ষার পর অনেকেই কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শিল্প কাজে ও বাণিজ্যে, সেলাইয়ের কাজে, দ্রব্যশিল্পে, চামড়া রং এর কাজে, পশু পালনে,এমনকি হিসাব কিতাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময়ে প্রায় সকল আরব মহিলা সাধারণভাবে নিজ নিজ কাজে মহিলারা অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসলিম জননী সওদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানতেন।[৭৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে আরবের প্রায় সমস্ত তীব্ব বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিকিৎসার ব্যাপার যা আলোচনা করতেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাই মনে রাখতেন। এই সময়ে ইবনে বালদা লতা-পাতা দ্বারা বর্তমান যুগের কবিরাজ হেকিমদের মত রোগের চিকিৎসা জানতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সংশ্রবে থেকে মুসলিম জননী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিভিন্ন রোগের ওষুধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে তা মুসলিম মহিলাগণকে শিক্ষা দেন। মহিলাগণ যাঁরা ইলমে তীব্ব ও রোগী শুশ্রুষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রুষার কাজেও নিয়োগ করা হতো।[৭৫] সাহাবী উরওয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেছেন, ‘‘আমি উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে অন্য কোনো মহিলাকে ইলমে তীব্ব ও অস্ত্রপচার বিদ্যার অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি।[৭৬]

মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেছেনঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল সাহাবীর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশী হবে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে তাদের ফতোয়াগুলো পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাতজনের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত ব্যক্তির সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাও অন্তর্ভুক্ত।

ফতোয়া দানকারী সাহাবীদের দ্বিতীয় সারিতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর সাথে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মত মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবীদের মধ্যে হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আবূ যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এই দলের মধ্যে উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, লায়লা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শরীফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, খাওলা বিনতে তাওরীত রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, গামিদিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন।[৭৭]

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

كان الناس يأتونها من كل مصر.

"প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে লোক আসতো।"[৭৮]

হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফিয ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-ও তাঁদের একজন। আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।[৭৯]

আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما.

“আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।”[৮০]

মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ইমাদ আলহাম্বলী লিখেছেন, “যাঁরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছেন এরা দু’জনও তাদের শামিল। তারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মত ও সিদ্ধান্ত কখনো অগ্রাহ্য করতেন না, বরং তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করতেন।”[৮১]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, “আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে অনেক কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও আদবের কথা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরীয়তের এক চতুর্থাংশ আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।”[৮২]

হাফিয ইবনে হাজার (র.) অন্য এক স্থানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে হাদীস বর্ণনাকারী অষ্টাশিজন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত রাজনীতিবিদ এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। এদের সাথে আরও রয়েছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের মত খ্যাতনামা তাবি‘য়ী এবং আলকামা ইবনে কায়েসের মত নামজাদা ফকীহ। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ।[৮৩]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, “যদি সকল মানুষের জ্ঞান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য পত্নীগণের জ্ঞান একত্র করা হয়, তাহলে এককভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান হবে তাদের সকলের জ্ঞানের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ও ব্যাপক।”[৮৪]

ইমাম যুহরী (র.) অন্যত্র বলেছেন, “আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বড় বড় সাহাবীগণও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন।”[৮৫]

প্রখ্যাত আলেম বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) একখানা কিতাব রচনা করেছেন, যাতে একটি বিষয়ই সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তা হলো, ‘‘অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মোকাবেলায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর ভিন্ন মতসমূহ।’’ কিতাবের নাম দিয়েছেন- ‘‘আল্-ইজাবাহ্ লিঈরাদি মাস্তদরাকাৎহু আয়িশা ‘আলাস্ সাহাবাহ্’’। তিনি এ কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবটিতে আমি এমন সব কথা সংকলিত করেছি যে ব্যাপারে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী মত ব্যক্ত করেছেন বা বিরোধী মত পোষণ করেছেন অথবা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। অথবা সে বিষয়ে তিনি সমকালীন আলিমগণের মতামত অগ্রাহ্য করেছেন, কিংবা তাঁর মতের দিকে সমসাময়িক আলিমগণের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন। অথবা ফতোয়া প্রদান করে সে বিষয়টি তিনি মুক্ত করেছেন বা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী শক্তিশালী মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন।

উমর ইবনু খাত্তাব, আলী ইবনু আবূ তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম এবং এঁদের মত ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম-এর সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিভিন্ন বিষয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ইমাম যারকাশী এ কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এসব মতামতের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

‘আল্-ইজাবাহ্’ কিতাবের ব্যাখ্যাতে বিশিষ্ট আলিম সাঈদ আল্-আফগানী বলেছেন, ‘‘আমি কয়েক বছর যাবত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জীবন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্রবক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মত। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞানেরই সন্ধান করতে চান না কেন, চাই তা ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ তালিকা, গৌরবগাঁথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস, যাই হোক না কেন, আপনি তাঁর মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারটা আপনাকে দস্তুরমত হতবাক করে দেবে। আপনি আরও অবাক হবেন, যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তাঁর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স আঠার বছর অতিক্রম করে নি।’’[৮৬]

উম্মূল মু‘মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ভাণ্ডার হতে মুসলিম উম্মাহ্ কি পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর খিদমতে হাযির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে, কূফার কিছুসংখ্যক মহিলা পূর্বেই তাঁর খিদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়

এবং হায়েয ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এভাবে কত জায়গায় কত মানুষ যে তাঁর নিকট হতে শত শত মাসআলা জেনে নিয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।[৮৭]

উম্মূল মুমেনীন উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বত্রিশজন রাবীর নাম বর্ণনা করার পর হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেনঃ এ ছাড়া আরও অনেক লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী ও তাবি'ঈ উভয় শ্রেণীর লোকই রয়েছেন।[৮৮]

মারওয়ানের একটি জরুরী বিষয় জানা প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বলেনঃ

كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

''নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র পত্মীগণ আমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে আমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাব কেমন করে? তাই তিনি লোক মারফত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। তিনি তার সে সমস্যার সামাধান করে দেন।[৮৯]

সাহাবীগণের 'ইলমী মতপার্থক্য দূরীকরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণ বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র.) বলেনঃ

''সাহাবীগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে এবং উম্মুল মু'মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।''[৯০]

রুবাই' বিনতে মু'আওয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহা একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জানার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও কখনো কখনো তাঁর নিকট হাযির হতেন। এ থেকেই তাঁর জ্ঞানের মর্তবা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।[৯১] রুবাই' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একুশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালিক, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান, নাফে', উবাদ ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইবনে যাকওয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, আবূ উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ রয়েছেন।[৯২]

ফাতিমা বিনতে কায়েস একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে চৌত্রিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান-এর মত সাহাবীগণ রয়েছেন। এছাড়া সুলাইমান ইবন ইয়াসার এবং শা'বীর মত উচ্চ মর্যাদার তাবি'ঈগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন।

উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) লিখেছেন, ‘‘তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যার জানাযার গোসলে শরীক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীসই মূলভিত্তি। সাহাবা এবং বসরার তাবি‘য়ী আলিমগণ তাঁর নিকট থেকেই মৃতকে গোসল দেয়ার নিয়ম-কানূন শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর থেকে আনাস ইবনে মালিক, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন এবং হাফসা বিনতে সিরীন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।’’[৯৩]

সা‘আদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ূব সাখতিয়ানী এবং হিকাম ইবনে উতায়বার মত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।[৯৪] ইমাম শাফে‘য়ী (র.) হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নাতনী সাইয়িদা নাফিসা (র.)-এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[৯৫]

# হাদীসচর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান

ইসলামের শুরু থেকে পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের দ্বারা হাদীস সংরক্ষণ, হাদীস চর্চা, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি চলেছে। মুসলিম ইতিহাসে সর্বদাই কিছু বিখ্যাত হাদীসবেত্তা নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জীবন-চরিত সম্বন্ধীয় অভিধানে এরূপ অনেক মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে এবং পরে অনেক মহিলা সাহাবী বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হাদীস বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবীবা, মায়মূনা এবং উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রতিটি হাদীসের ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।

তাবি'য়ীদের যুগে ইবনু সিরীনের কন্যা হাফসা, উম্মে আবূ দারদা এবং 'আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান গুরুত্বপূর্ণ হাদীসবেত্তা হিসেবে পরিচিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হাদীসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন 'আমরাহ্ (র.)। তাঁর এক ছাত্র হচ্ছেন আবূ বকর ইবনে হাযম যিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, যিনি 'আমরাহ্ এর বর্ণিত সকল হাদীস লিখে ফেলার জন্য তৎকালীন খলীফা উমর ইবন আব্দিল আযীয (র.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন।

এদের পরে 'আবিদা, 'আবদা ইবন বিশর, উম্মে 'উমর, যয়নাব, নফিসা, খাদীজা, 'আবদা বিনতে 'আব্দুর রহমান এবং আরো অনেক নারী হাদীসের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা হাদীস শিক্ষা দিতেন। এসব নারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকেই এসেছেন। যেমন আবিদা একজন দাসী ছিলেন এবং এ অবস্থায় থেকেই তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট হাদীস চর্চা করেন। এটা বলা হয় যে, তিনি দশ সহস্রাধিক হাদীসকে তাঁর শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগ্রাহক অনেক নারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি প্রধান সংগ্রহে অনেক নারীর নাম রয়েছে।

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে আমরা ফাতিমা বিনতে আব্দির রহমান, ফাতিমা (আবূ দাউদের নাতনী), আমাত আল্-ওয়াহিদ (বিখ্যাত আইনবিদ আল্-মুহামিলির কন্যা), উম্মে আল্-ফাৎহ আমাত আস্-সালাম (বিচারক আবূ বকর আহমদের কন্যা), জুমু'আ বিন্তে আহমদ ও আরো

অনেক বিদূষীর পরিচয় পাই যাঁদের ক্লাসে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত থাকত।

এ ধারা ৫ম ও ৬ষ্ঠ হিজরী সন পর্যন্ত চালু ছিল। ফাতিমা ইবন আল্-হাসান শুধু তার তাকওয়ার জন্যই পরিচিত ছিলেন না বরং হাদীস ও এর ইসনাদের গুণাগুণ বিচারে তাঁর জ্ঞানের প্রখরতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। তার চেয়েও বেশি পরিচিত ছিলেন কারিমা আল্-মারওয়াযিয়্যা। তিনি ঐ সময়ে সহীহ্ আল্-বুখারীর সর্বোত্তম অথোরিটি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল্-খতিব আল্-বাগদাদী ও আল্-হুমাইদী তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন।

শুহাদা (একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার) অত্যন্ত সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তাঁর পরিচয় দেন এভাবে- তিনি ক্যালিগ্রাফার ও বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং নারী জগতের জন্য গর্ব ছিলেন। তার পিতা আবূ নাসর স্বীয় কন্যাকে গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদদের অধীনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহীহ্ আল্-বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহ হতে তার বক্তৃতামালা শুনতে অনেক জ্ঞানপিপাসু জমায়েত হত; এমনকি কেউ কেউ তাঁর ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাত্র হবার মিথ্যা দাবী করত। সিইত আল্-ওজারা শুধু ইসলামী আইনের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি, তিনি 'তাঁর সময়ের মুসনিদা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিজাযের হাদীসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উম্মে আল্-খায়ের আমাত আল্-খালিক এভাবে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করতেন। অন্যদিকে উম্মে আল্-খায়ের ফাতিমা এবং ফাতিমা আল্-শাহরাজুরিয়া সহীহ্ মুসলিম-এর উপর লেকচার দিতেন। ফাতিমা আল্-জাওযানিয়া তাবরানী থেকে তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। যয়নাব ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের 'মুসনাদ' থেকে পড়াতেন। সেখানে অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে তার বক্তৃতা শুনত। জুওয়াইরিয়া বিনতে উমর এবং যয়নাব বিনতে আহমদ ইবনে উমর, আদ্-দারেমী ও আবদ ইবনে হুমাইদ এর হাদীস সংকলন হতে বর্ণনা করতেন।

বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, পরিব্রাজক ইবনে বতুতা দামেশকে থাকার সময় যয়নাব বিনতে আহমদ ও অন্যান্য শিক্ষিকার নিকট হাদীসের বিদ্যা লাভ করেন। দামেশকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির বলেন, তিনি ১২০ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সুয়ূতী ইমাম শাফে'য়ীর 'রিসালাহ্' গ্রন্থটি হাজার বিনতে মুহাম্মদের কাছে অধ্যয়ন করেন।

এ ছাড়াও যয়নাব বিনতে আল শা'রি একাধিক প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং পরে ছাত্রদেরকে এসব শিক্ষা দেন যাদের কেউ কেউ পরে খ্যাতি লাভ করেন। যেমন সুপরিচিত জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অভিধান 'ওয়াফাত আল্-'আ'ইয়ান' এর লেখক ইবনে খাল্লিকান তাঁর ছাত্র। আরেকজন হচ্ছেন কারিমা যাকে তাঁর সময়ে সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসেবে ধরা হয়। ইবনে হাজার তার 'আল্-দুরার আল্-কামেনা' গ্রন্থে ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেন। যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন এবং

যাঁদের অনেকের অধীনে তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন। এসব মহীয়সী নারীর কয়েকজন আবার ঐ সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ জুয়াইরিয়া বিনতে আহমদ-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি পুরুষ ও নারী উভয় রকমের পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি নিজেও ঐ সময়ের বড় বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন।

ইবনে হাজার (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার নিজের কিছু শিক্ষক এবং সমসাময়িক অনেকেই তাঁর বক্তৃতামালা শুনতেন।' আয়েশা বিনতে আবদ আল্-হাদী দীর্ঘদিন ইবনে হাজারের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ মানের হাদীসবিদ হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক ছাত্রই দীর্ঘ পথ সফর করে তাঁর কাছে দ্বীনের সত্যজ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসত।

নবম শতাব্দীতে হাদীসে নারী বিশেষজ্ঞদের সকল তথ্য পাওয়া যাবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল্-সাখাবী রচিত "আদ-দ্বাউ উল-লামে' " গ্রন্থে। এছাড়াও আবদ আল্-আযীয ইবনে উমর তার 'মু'জাম আল-শুয়ূখ' গ্রন্থটিতে ১৩০ জন নারী স্কলারসহ ১১০০-এর বেশী লেখকের শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব মহিলাদের কেউ কেউ হাদীসবিদ্যায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ সময়ে প্রখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে উম্মে হানী, মারিয়াম উল্লেখযোগ্য। যিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেযা হয়ে যান এবং ইসলামের থিওলজি, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীরতা লাভের প্রত্যাশায় কায়রো ও মক্কা শহরে গিয়ে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এতটাই দ্বীনদার ছিলেন যে, ন্যূনপক্ষে ১৩ বার হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত কলেজে ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। অনেক স্কলারকে 'ইজাযত্' (তাঁর পক্ষ থেকে হাদীস প্রচারের অনুমতি) প্রদান করেন।

তাঁর সমসাময়িক সিরিয়ার বাই খাতুন হাদীস শাস্ত্রে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট হতে 'ইজাযত' পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিরিয়া ও কায়রোতে অনেক বক্তব্য রাখেন। আয়েশা ইবন ইবরাহীম ও মক্কার উম্মে আল্-খায়ের সাঈদা উভয়েই দামেশক, কায়রোসহ অন্যান্য শহরে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা বিভিন্ন শহরে সুনামের সাথে অন্যদেরকে শিক্ষা দেন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, হিজরী দশম শতাব্দী হতে হাদীস শাস্ত্রে ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যলাভে নারীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ব্যাপকহারে কমে গেছে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মাত্র ডজন খানেক প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ নারীর নাম পাওয়া যায়। যাঁরা মূলত নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হন। আসমা বিনতে কামাল আল্-দীন হাদীসের উপর লেকচার দিতেন। ঐ সময়ের সুলতানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রখ্যাত বিচারক মুসলেহ আল-

দীনের স্ত্রী আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ দামিস্কের সালিহিয়া কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। এলেপ্পোর ফাতিমা বিনতে ইউসুফ তাঁর সময়ের অন্যতম পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ফাতিমা আল্-জুযাইলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং সেখানে সমৃদ্ধ এক পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। পবিত্র মক্কা শহরে তিনি হাদীসের উপর লেকচার দিতেন এবং অনেকেই তাতে অংশগ্রহণ শেষে তাঁর নিকট হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতেন।

ইতিহাস ঘাটলে এটা পরিষ্কার হয় যে, মুসলিম নারীরা জ্ঞানার্জনে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হবার চেষ্টা চালিয়েছেন।ইবনে আল্-বুখারীর সার্টিফিকেট ফলিওতে দেখা যায়, ৫৮৭/১২৮৮ সনে দামিস্কের উমর মসজিদে অনুষ্ঠিত ১১ বক্তৃতার একটি নিয়মিত কোর্সে অনেক নারী উপস্থিত থাকতো। অন্যদিকে দামিস্ক (৮৩৭/১৩২২ সনে) পাঁচ লেকচারের একটি কোর্সে পঞ্চাশাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এ কোর্সটি পরিচালিত হত প্রখ্যাত মহিলা হাদীস বিশারদ উম্মে আব্দুল্লাহ কর্তৃক।[৯৬]

অতএব, ইসলামের শিক্ষাবিস্তারে নারীর অবদান কতটুকু তা চোখ বন্ধ করেই অনুধাবন করা যায়। আর এ নারীদের অসামান্য অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেই বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ইবনুল কাইয়িম (রা.) বলেন, সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীই যেন পুরো সমাজ।

নারী তার প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করবে এবং তার এই প্রবেশকে ইসলাম স্বাগত জানায়। তবে লজ্জাই নারীর ভূষণ। নারী যদি লজ্জা বিসর্জন দিয়ে সমাজের কাছ থেকে জোর করে তার অধিকার পেতে চায়, তবে ইসলাম তার এই কাজেই বাধ সাধবে। শালীনতা বিবর্জিত কোনো কাজই ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম উদার নীতি পোষণ করে, কিন্তু এই উদারতার সুযোগ নিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টিকে ইসলাম কঠোরভাবে সমালোচনা করে। শিক্ষা অন্বেষণের দোহাই দিয়ে কোনো নারীকেই তার শালীনতা ও সতীত্ব বিসর্জন দেওয়াকে কিছুতেই অনুমোদন করে না। শিক্ষার পবিত্র অন্বেষণকে ইসলাম সর্বদা উৎসাহ দিয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও দেবে। [৯৭]

# সহ-শিক্ষা

কোনো যুবক-যুবতী যুগলকে যদি অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থানের সুযোগ করে দিয়ে বলা হয়, তোমরা কেউ কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না- তাহলে এ উপদেশও কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না। সহশিক্ষার কুফল কি হতে পারে তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সহশিক্ষা ব্যবস্থা গোটা মানবজাতিকে যে অকল্যাণ, অবক্ষয় এবং অশান্তি দান করেছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেও মানুষ এ থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ, মানব রচিত আইনে এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আছে শুধু সমস্যা বৃদ্ধির অসংখ্য উপায়। সহশিক্ষা ব্যবস্থা মানব জাতির যে ভয়াবহ ও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তন্মধ্যে নৈতিক চরিত্রের অবনতি, দাম্পত্য জীবনে চরম অশান্তি, অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যৌতুক প্রথা, তালাক, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, মাদকদ্রব্যের অবাধ ব্যবহার, অযোগ্য সন্তানের প্রাদুর্ভাব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সহশিক্ষার কারণে নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ও অবক্ষয় হয়েছে তা বর্ণনাতীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

সহশিক্ষার কুফল হলো দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ে বহু ছেলেমেয়ের সাথে অবাধে কথা বলার এবং যথেচ্ছা মেলামেশার করা সুযোগ পায়। এ অভ্যাসের কারণে সহপাঠী ও সহপাঠিনী ছাড়াও বাইরের ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশা চলে। এদের মধ্যে যার সাথে তথাকথিত প্রেম জমে ওঠে, তার সাথে বিয়ে না হলে, বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মেনে নিতে পারে না। সারা জীবন চলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি। কেউ কাউকে বরদাশত্ করতে পারে না। আবার প্রেমের বিয়ে হলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণই ঘটে বেশি। এভাবেই সৃষ্টি হয় গরমিল আর পরিণামে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা- তালাক।

সহশিক্ষার বদৌলতে মেলামেশার কারণে একই সময়ে একজন যুবক কিংবা যুবতী অনেকের সাথে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পায়। একই নারী বা পুরুষকে নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। কেউ আবার একজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর তাকে বাদ দিয়ে অপর একজনকে পেতে চায়। এর ফলে শুরু হয় রেষারেষি, এসিড নিক্ষেপ, খুন-খারাবি ইত্যাদি।অতএব, গোটা জাতিকে আল্লাহর গযব, অপূরণীয় ক্ষতি, ধ্বংস এবং বিপর্যয় থেকে সর্বস্তরে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জাতীয় কর্তব্য।[৯৮]

## পশ্চিমা সংস্কৃতি ও তাদের অনুসারীরা শিক্ষাকে যে পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে

নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে পশ্চিমাদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা নারীর অধীকার নিয়ে কথা বলে, নারী-পুরুষের সমতার কথা বলে নারীকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর করেছে। পেশাগত ক্ষেত্রে, যেমন আইন ও চিকিৎসা, নারীদের সুযোগ সীমিত ছিল,সে সুযোগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখনও তাদের সুযোগের সমতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এবং বিতর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক।

যেই সমতার কথা তারা বলে, সেই সমতা ইসলাম সমর্থন করে না। তাছাড়া যুক্তিতেও বোঝায় যে তারা যেই সমতার কথা বলে আসছে, সেটা বাস্তবে হয় না। তাদের কথানুযায়ী যদি সমতা বিধান করা হয়, তাহলে মূলত নারীকে তার অধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হয়। তার উপর জুলুম হয়ে যায়। তারা নারীকে পুরুষের মতো শিক্ষার সব শাখায় বিচরণের স্বাধীনতার কথা বলে। আর সেটা করতে গিয়ে তারা নারীকে ঘর থেকে বাইরে বের করে এনেছে। পুরুষের পাশাপাশি সব ধরনের কাজ তারা করবে। কিন্তু এর মাধ্যমে প্রথমত নারীকে তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে ঠেলে দেয়া হয়। নারীকে ঘরও সামলাতে হচ্ছে, আবার বাইরেও দেখতে হচ্ছে। কিন্তু সে বিবেচনায় পুরুষের অতো দিক করা লাগছে না, যতটা না নারীকে কষ্ট করতে হচ্ছে। তাহলে সমতা বিধান কিভাবে হলো?

পশ্চিমারা শিক্ষাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেনো জীবনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। ক্যারিয়ারই যেনো সবকিছু। কেউ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হলে,কারো ভালো ক্যারিয়ার না হলে সে যেনো মর্যাদা পাওয়ারই যোগ্য না- এমন হয়ে গেছে অবস্থা।

আবার নারী শিক্ষার নামে তারা যে শিক্ষার কথা বলছে, তা একদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ,অন্যদিকে তা নারীকে মূল্যবোধের শিক্ষা, উন্নতির প্রকৃত শিক্ষা না দিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুসরণ কারী বানাচ্ছে, ইসলামের বিপক্ষের কথা বলার জন্য তৈরি করছে, ভুলিয়ে দিচ্ছে তার আসল পরিচয় ও সংস্কৃতিকে।

তারা নারীশিক্ষা নারীশিক্ষা করে, অথচ নারীদের জন্য ইসলামী শিক্ষার কথা বলে না, ইসলামী শিক্ষার কথা আসলে তার বিপক্ষে বলা শুরু করে। তারা বলতে চায় তারা নারীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার কথা বলে, অথচ মানুষ হিসেবে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সবচেয়ে প্রথমে আসে, যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরী সেটাকে তারা জরুরী বলতে চায় না। মূলত তারা নারীকে আধুনিক শিক্ষার নামে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দাবী জানায় ,যে শিক্ষা নারীর স্বাধীনতার নাম করে নারীর নিরাপত্তাজনিত হুমকির কারণ হয়।

# পশ্চিমাদের দাবী, যুক্তি ও তার জবাব

আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধি-বিধান নারীদেরকে দিয়েছেন ,সেগুলো সবই নারীর নিরাপত্তা এবং তার সম্মানের হিফাজতের জন্যই দিয়েছেন। একমাত্র ইসলামের মধ্যেই রয়েছে তাদের কল্যাণ এবং নিরাপত্তা রক্ষার নিশ্চয়তা। নারী যাতে ফিতনামুক্ত পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে, কোনো বিপদ ও নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন না হয়, ইসলাম সে ব্যাবস্থাই করেছে। সকল ভ্রান্তি, বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা থেকে তাদের রক্ষা করে ইসলাম।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে নারীরা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। প্রগতিবাদ, নারী-স্বাধীনতা, সমান অধিকার ইত্যাদি ভুয়া স্লোগান তুলে ইসলামের শত্রুরা নারীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের লক্ষবস্তুতে পরিণত করছে। নারীর সম্মান, আত্মমর্যাদা, ইজ্জত, পবিত্রতা ধ্বংসের জন্য তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার করছে। পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম নারীরাও আজ বিজাতিদের অনুসরণ করা শুরু করেছে, পর্দাকে উন্নতির অন্তরায় মনে করছে, আল্লাহর বিধানকে নিজেদের জন্য জেলখানার শিকল মনে করে নিজেদেরকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যার ভয়াবহতা ও করুণ পরিণতি সম্পর্কে তারা আদৌ অবগত নয়।

বর্তমানে আলেম-উলামা, সত্যিকার দাঈগণ নারীদের এ সব বিপর্যয় ও মহামারী থেকে রক্ষা করার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পশ্চিমারা এবং তাদের অন্ধ অনুসারীরা নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের দাবী দাওয়া উত্থাপন করে। যেমন-

- পর্দার বিরোধিতাঃ তারা বলতে চায় ইসলাম নারীকে পর্দার বিধান

দিয়ে ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। পর্দার বিধান নারীকে অগ্রসর হতে বাঁধা দেয়। পর্দাকে তারা মৌলবাদিদের ষড়যন্ত্র বলতে চায়।

জবাবঃ  ইসলাম নারীর ইজ্জত, সম্মান ও সুরক্ষার দিকটা নিশ্চিত করেছে পর্দার মাধ্যমে। পর্দার হুকুম নারীকে তার স্বকীয়তা বজায় রাখাতে সাহায্য করছে। তাছাড়া পর্দা তো নারীকে তার শিক্ষার্জনে বাঁধা দিচ্ছে না। পর্দার পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে তো নারীর শিক্ষার্জনে কোনো সমস্যা নেই। আর পর্দা করা ফরজ ,তা কুরআন-হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

অর্থঃ হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে

এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আল আহযাব,আয়াতঃ ৫৯]

وَ اِذَا سَاَلۡتُمُوۡهُنَّ مَتَاعًا فَسۡـَٔلُوۡهُنَّ مِنۡ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِکُمۡ اَطۡهَرُ لِقُلُوۡبِکُمۡ وَ قُلُوۡبِهِنَّ ؕ وَ مَا کَانَ لَکُمۡ اَنۡ تُؤۡذُوۡا رَسُوۡلَ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَنۡ تَنۡکِحُوۡۤا اَزۡوَاجَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِکُمۡ کَانَ عِنۡدَ اللّٰهِ عَظِیۡمًا .

অর্থঃ আর যখন নবীপত্নীদের কাছে তোমরা কোন সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। আর আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার (মৃত্যুর) পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনো তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। নিশ্চয় এটি আল্লাহর কাছে গুরুতর পাপ। [সূরা আল আহযাব,আয়াতঃ ৫৩]

আয়েশা রা. বলেন, আমরা হজের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। যখনই কোনো আরোহী দল আসত, আমরা আমাদের মাথার উপর থেকে চেহারার সামনে কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। যখন তারা চলে যেত, তখন আমরা তা সরিয়ে দিতাম। [৯৯]

- মৌলবাদীরা হাত থেকে নারীর মুক্তিঃ তারা বলতে চায়,মৌলবাদীরা নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে।তাই তাদের থেকে নারীকে বাঁচানোর দাবী করে তারা।

জবাবঃ এ দাবি করে তারা নিজেদের জালেই মূলত ফেসে যাচ্ছে। তারা বলছে, মৌলবাদীদের হাত থেকে নারীকে বাঁচাতে,কারণ হিসেবে তারা বলতে চায়, মৌল চিন্তাভাবনা নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। কিন্তু তারা নিজেরা ইসলামী শিক্ষার বিপক্ষে। তাহলে তারাতো এদিকে নারীকে ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেলো না?

সহশিক্ষা, শরীয়ত বিরোধী পরিবেশ, নারীর সুরক্ষার শতভাগ সুবিধা না থাকায় এবং বিশেষত জাগতিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী বৈষম্যতার দরুণ বর্তমান ফিৎনার যুগে ইসলামী শরীয়ত নারী শিক্ষায় কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে। সেসব দূর করা গেলে বা এসব সমস্যা না থাকলে নারীর শিক্ষার উপর ধর্মীয় কোন বাধা-নিষেধ নেই।

- নারীর জন্য আধুনিক শিক্ষার্জনের ব্যবস্থার দাবীঃ ইসলাম নারীকে আধুনিক শিক্ষার্জনে বাঁধা দেয় বলে তারা বলে থাকে।

জবাবঃ তাদের এ দাবি সত্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে অনেক মহিলা সাহাবি যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা প্রদানের দায়িত্বে ছিলেন। বেসিক মেডিকেল নলেজ ছাড়া সেটা সম্ভবপর ছিল না।খিলাফতের পরবর্তী জমানায় হেরেমের নারীদেরকে অস্ত্রবিদ্যা, ভূগোলশাস্ত্র, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হতো। হেরেমের এই নারীরাই পরবর্তীতে যুবরাজদের মা হতেন এবং যুবরাজদের শিক্ষাদিক্ষা শুরু হতো তাদের মায়েদের হাত ধরেই। নারীদের পড়াশোনায় না বরং পড়াশোনার ধরনে ইসলাম মূল বিরোধিতা করছে।

- নারী-পুরুষের সমতার দাবীঃ শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে তারা নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবী জানায়।

জবাবঃ বারবার তারা সমতা ও সমান অধিকারের কথা বলে। কিন্তু সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ-মহিলা সকলেই বোঝেন, যেখানে ভিন্নতা প্রযোজ্য ও ন্যায়সংগত সেখানে সমতার দাবি অন্যায়। বরং যে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ন্যায়সংগত তা হল ন্যায্য অধিকার। সেটা ক্ষেত্র বিশেষে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানও হতে পারে, কম বেশিও হতে পারে। সব জায়গায় সমান করার দাবি যেমন অবাস্তব তেমনি অন্যায়। নারীর প্রতিও তা অন্যায়।

যারই আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে, সেই বুঝতে সক্ষম– অধিকার তো যিনি খালেক, মালেক, রাব্বুল আলামীন, তিনিই নির্ধারণ করতে পারেন। কাজেই অধিকারের নাম ব্যবহার করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করার অধিকার কারও নেই।

- পর্দা করে সবকিছু করাঃ তাদের একদল তো পর্দার ঘোরতর বিরোধী। আরেক দল আবার বলতে চায়, পর্দা করে সব ই করা যায়।

জবাবঃ করতে চাইলে তো কতকিছুই করা যায়। কিন্তু সেটাতে পর্দার আসল উদ্দেশ্য বা মাহাত্ম বজায় থাকছে কিনা সেটা দেখার বিষয়। পর্দা মানে শুধু এক টুকরো কাপড় দিয়ে নারীকে আবৃত করা না, পুরুষ নারী অবাধ মেলামেশা করবে না, নজরের হেফাজত করবে, যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে শুধুমাত্র প্রয়োজনে কথা বলা- এসব নিশ্চিত করা। কিন্তু পুরুষের পাশাপাশি কাধে কাধ মিলিয়ে সব করতে গেলে সেটা বজায় থাকছে না, পাশাপাশি পুরুষের সব কাজ নারীর জন্য প্রযোজ্যও না, বরং সেগুলো নারী সত্তাকেই পরিবর্তন করে ফেলে।

- সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি দেশের সাময়িকভাবে নারীদের শিক্ষা স্থগিত রাখাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছে অথচ তারাই এক সময় নারীর সম্মান ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছিল, 'মুক্তির' নামে যারা নারীদের উপহার দিয়েছিলো অবমাননা আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ। তারা আজ বড় গলায় কথা বলছে নারী অধিকার নিয়ে। অথচ বাস্তবতা হলো, এই অধিকার রক্ষার দাবির পেছনে রয়েছে তাদের নিজেদের স্বার্থ ।

জবাবঃ 'স্থগিত' কখনোই 'নিষেধ' নয় না ভাষায়, না বাস্তবে, না ব্যাখ্যায়, না প্রয়োগে। শিক্ষা একটি স্বাভাবিক ও মৌলিক প্রয়োজন। সে দেশের সরকার নারীদের শিক্ষায় কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি, বরং এমন কিছু বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, যেগুলো জনগণের ক্ষতির কারণ হতে পারত। তাই কিছু সময়ের জন্য তারা শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও স্থায়ী ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। সরকার গঠনের সময় তারা এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, যেখানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল দখলদার শক্তির নোংরা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার একটি প্রধান মাধ্যম। শিক্ষা-যা একটি জাতির মেরুদণ্ড-তাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল জনগণের সুস্থ চিন্তা-চেতনা পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে।

শিক্ষা একটি স্বাভাবিক, সহজাত ও অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে কিছু অগ্রাধিকার থাকে, কিছু করণীয় সামনে আসে, যেগুলো মেনে পথ চলতে হয়।

যখন পরাশক্তি সে দেশে অনুপ্রবেশ করে, তখন তাদের লক্ষ্য শুধু সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল না বরং সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারও ছিলো তাদের টার্গেট। তারা সরকারের ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি পাঠ্যক্রমেও হাত দেয়। পরিবর্তনের নামে বাদ দেওয়া হয় এমন সব বিষয়, যেগুলো সে দেশের মানুষের ইসলামি পরিচয়, সংস্কৃতি ও প্রতিবোধচেতনার সঙ্গে জড়িত।

তার বদলে ঢোকানো হয় এমনসব ধারণা, যেগুলো ছিল দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ-যেমন বিকৃত নারীবাদ, লিঙ্গ সমতা নিয়ে অতিরঞ্জিত দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি এমন শিক্ষাও যা নারী-পুরুষের সহজাত পার্থক্য মুছে দিতে চায়।

এই ছিল দখলদারদের প্রকৃত যুদ্ধ-মানসিক দখলদারির যুদ্ধ। শুধু ভূখণ্ড নয়, তারা চেয়েছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস সবকিছু নিজেদের মত করে গড়ে তুলতে।

কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

ফলে এখন সরকার দায়িত্ব নিয়েই সিদ্ধান্ত নেয় পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর। আর তাই সাময়িকভাবে কিছু কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়, যেন ইসলামি মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে একটি স্থায়ী, সুগঠিত পাঠ্যক্রম গড়ে তোলা যায়।

এটা কোনো নিষেধাজ্ঞা নয়-এটা একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়ার অংশ। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো এটাকে ভুলভাবে তুলে ধরছে, 'মানবাধিকার' আর 'নারীর স্বাধীনতা'র স্লোগানে।

তারা প্রশ্ন তোলে-মেয়েদের শিক্ষাই বন্ধ কেন? কিন্তু বাস্তবতা হলো, আজও অনেক মেয়ে শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত নিয়মিত পড়াশোনা করছে।

আসলে সমস্যা শুধু ছেলেমেয়ের একসঙ্গে বসে পড়া নয়। বড় সমস্যা হলো সেই পাঠ্যক্রম, যা তাদের স্বভাবগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে, তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয়ের সঙ্গে যায় না।

সরকার এখন চেষ্টা করছে এই বিকৃত পাঠ্যক্রমকে সংস্কার করতে। এ কাজ সময়সাপেক্ষ, প্রয়োজন ধৈর্য ও বিস্তৃত পরিকল্পনার। ছোট ছোট মেয়েদের জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই এখন মূল লক্ষ্য, যা তাদের পরিচয় ও বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় এবং ভবিষ্যতে একটি সুস্থ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

এই প্রক্রিয়াটিই এখন চলমান, আর এটাই সেই 'স্থগিতাদেশ'-এর পেছনের প্রকৃত সত্য। [১০০]

- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার দাবীঃ তারা নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার দাবী করে এবং যেসব কাজ পুরুষের জন্য প্রযোজ্য তা নারীদেরও করতে দেয়ার জন্য

সুযোগ দাবী করে। অথচ তাদের জন্য যেসব কাজ প্রযোজ্য এবং তাদের স্বভাবের সাথে যেসব কাজের সম্পর্ক রয়েছে, সে কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাকে তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বলে দাবী করে।

জবাবঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ বাস্তবতার পরিপন্থী ও অবান্তর। ইসলামী শরী'আত নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, অপরিচিত পুরুষদের সাথে একজন একাকী নারীর একান্ত হওয়া এবং নারীদের একাকী সফর করা ইত্যাদিকে যে হারাম করেছে,তারা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এর ফলে যেসব ক্ষতি বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়, তা কখনোই প্রশংসনীয় হতে পারে না। অথচ ইসলামে ইবাদতের স্থানেও নারীদের পুরুষদের সাথে একসাথে ইবাদত করতে নিষেধ আছে। সালাতে নারীদের কাতার পুরুষদের কাতারের পিছনে হবে এবং নারীদেরকে তাদের ঘরে সালাত আদায়ের জন্য উতসাহ দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ .

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর বান্দিদের মসজিদে গমন করতে বাধা দিও না। আর তাদের ঘরসমূহ তাদের জন্য অতি উত্তম। [সুনান আবু দাউদ]

এখানে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যদি নারীরা মসজিদে গমন করতে চায়, তাতে তাদেরকে নিষেধ করা যাবে না। কিন্তু তাদের জন্য ঘরে সালাত আদায় করাই উত্তম। কারণ, বর্তমান ফিতনা-ফাসাদের যুগে নারীদের ঘর থেকে বের না হওয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা। আর ইসলাম এসব আদেশ এ জন্য দিয়েছে যাতে নারীদের সম্মান-হানি না ঘটে এবং তাদের যাবতীয় ফিতনার কারণ হতে দূরে রাখা যায়। সুতরাং মুসলিমদের ওপর কর্তব্য হলো, তারা যেনো তাদের নারীদের সম্মান রক্ষায় মনোযোগী হয় এবং ষড়যন্ত্রকারীদের অবান্তর দাবীগুলোর প্রতি কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে। আর তাদের অবশ্যই শিক্ষা  গ্রহণ করতে হবে সেসব দেশের নারীদের করুণ পরিণতি হতে, যারা এ সব অবান্তর, মিথ্যা ও ভ্রান্ত দাবিগুলোকে গ্রহণ করে বিপদে পড়ছে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের বেড়া জালে পা দিয়ে চরম অশান্তিতে কালাতিপাত করছে। [১০১]

ইসলাম যেখানে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার দেয়ার পর নারীর নিরাপত্তার স্বার্থেই কিছু বিধান দিয়েছে, সেখানে নিজেদের মনমতো সমতার দাবী তুলে সেই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লাগার যৌক্তিকতা কতখানি সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

# বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয়

বর্তমান বিশ্ব কুফরি ব্যবস্থার উপর চলছে। এ ব্যবস্থায় পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে পর্দাজনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মত মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি থাকা দরকার। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেনঃ "এ সকল ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী।" সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী তথা মানবতা বিরোধী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ মুসলিম মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক করা এবং মহিলাদের চরিত্র গঠনসহকারে শরী'আতের নীতি অনুসারে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো দরকার।[১০২]

যেহেতু খিলাফত ব্যবস্থা নাই, তাই অনেক নারীকে সঙ্গত কারণেই বাইরে বের হতে হয় চাকরীর সন্ধ্যানে। ধর্মীয় শিক্ষা না থাকায় মানুষের মাঝেও নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা নাই। নারীকে যথেষ্ট সম্মান, মর্যাদা প্রদান এবং তার যথাযথ ভরণপোষণ না দেয়াতে, গাইরতবোধ পুরুষের মাঝে না থাকাতে এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাজের মানুষের কথার তীরে ক্ষত বিক্ষত হয়ে অনেক নারীকে না চাইলেও পুরুষের সাথে অভিন্ন জায়গায় কাজ করতে হচ্ছে। একই কারণে পড়ালেখাও সহশিক্ষার পরিবেশে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। তাই একদিকে দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক। ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা এবং পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরী। নইলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার নিরাপদ পরিবেশ নেই, সে পরিবেশে নারী কখনোই যেতে পারে না।

যে সরকার ও সমাজ নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না, তাদের মুখে নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির কথা মানায় না। বৃটিশ আমলে মুসলমানরা নিজেদের উদ্যোগে লেখাপড়া শিখেছে। মেয়েরা ঘরেই শিক্ষিতা হয়েছে। তাতেই আমাদের মায়েরা যা জানতেন, আজকের একজন এম.এ. পাস মেয়েও তা জানে কি-না সন্দেহ। আর সেইসব দ্বীনদার পর্দানশীন মায়েদের গর্ভ থেকেই এসেছেন পরবর্তী নেতারা।[১০৩]

তাই সর্বোচ্চ আওয়াজ তুলে আমাদেরকে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দাবী জানাতে হবে। সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার দিকে জোর দিতে হবে যুগের প্রয়োজনেই। সাথে সর্বত্র ইসলামী শিক্ষার প্রচার করতে হবে।

# নারীর নিরাপদ শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

আমরা নারীর নিরাপদ শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিচের কয়েকটি ধাপে এগিয়ে যেতে পারিঃ-

- মসজিদে বা বাড়িতে নারীদের জন্যে আলাদা হালকার ব্যবস্থা করা: যে সব মসজিদে বা বাড়িতে নারীদের বসার আলাদা জায়গা রয়েছে সে সব মসজিদে বা বাড়িতে তাদের জন্য মাঝে মধ্যে আলাদা আলোচনার ব্যবস্থা করা উচিত। এসব বিশেষ সভায় নারীদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাস'আলা মাসায়েল আলোচনা করা প্রয়োজন। ইমাম সাহেবের স্ত্রী বা নিকটাত্মীয় মহিলা যদি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন তবে তাদের দ্বারা এসব আলোচনা সভার আয়োজন করা উত্তম। আর যদি এ ব্যবস্থা না থাকে তবে ইমাম সাহেব মসজিদ কমিটির সাথে আলোচনা করে কিছু বয়স্ক মুরুব্বী মুসল্লিদের সহযোগীতায় এ ধরনের সভার আয়োজন করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন কোনো ফেতনা ফাসাদের রূপ ধারণ না করে।
- মসজিদে মক্তব ব্যবস্থা আবার চালু করা: প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে সকালে মসজিদে মসজিদে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে মক্তব ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগে তা আর চোখে পড়ে না। শিশুদেরকে ছোট বেলায় কালেমা, নামায, রোযা, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি ইসলামী শিক্ষা মক্তব থেকেই শিক্ষা দেয়া হয়। তাই তো ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সারা দেশে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ব্যবস্থা চালু করছে। আমাদের সাধ্যানুযায়ী এ বিশেষ ফলপ্রসূ ব্যবস্থাটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- আধুনিক ও মানসম্মত মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা: আমাদের দেশে বর্তমানে কিছু কিছু মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো মানের বিচারে এখনও পিছিয়ে আছে। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ছাড়া বর্তমানে মানসম্মত প্রতিষ্ঠান কল্পনা করা যায়না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বিশ্ববিখ্যাত আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শাখার কথা বলতে পারি। সেখানে মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে (ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারী ও অন্যান্য শিক্ষা সহ) নার্সারি থেকে পি,এইচ,ডি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। সেখান থেকে মিশরের ও মুসলিম বিশ্বের নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের সর্বস্তরে সেবা দান করছে।
- প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে জোরদার করা: আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিপূর্বে ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমানে এ বিষয়টিকে অনেকটা অবহেলার ছলে পড়ানো হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুবই হুমকিস্বরূপ হয়ে দাড়াবে। স্কুল-কলেজ

ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হলে আজ নারীরা ইসলামী জ্ঞান থেকে এতটা দূরে থাকত না। বর্তমান সংস্কারকৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে ভবিষ্যতে মানুষ আল্লাহ-রাসুলকে চিনবে কিনা তা বলা দুস্কর। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া আদর্শ মানুষ গঠন করা সম্ভব নয়।[১০৪]

# চ্যালেঞ্জসমূহ ও তার মোকাবিলা

চ্যালেঞ্জের কথা বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে যেটা, সেটা খিলাফত ব্যবস্থা না থাকার অসুবিধা। খিলাফত ব্যবস্থা না থাকার কারণে নারী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ চলে আসে।

- অবকাঠামোগত
- অর্থনৈতিক
- সামাজিক
- প্রশাসনিক

প্রচলিত ব্যবস্থাতে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে আলাদা শিক্ষাব্যবস্থার কথা মানুষের জন্য ভাবা কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে। প্রচলিত ব্যবস্থা ও পশ্চিমা চিন্তাভাবনা মানুষকে ইসলামিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভীত করে রেখেছে, তাই এ ব্যবস্থার কথা উঠালেই মানুষ এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করে বসে। ফলে নারী-পুরুষ আলাদা শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাওয়াও কঠিন হয়।
খিলাফত ব্যবস্থার কেন্দ্রীভূত ওয়াক্‌ফ-ভিত্তিক অর্থায়ন না থাকায় রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বাজেট সীমিত। ফলে অবকাঠামো তৈরি কঠিন ও ব্যয়বহুল।
করতে চাইলেও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।
শিক্ষিকা সংখ্যার সংকট ও সীমাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবিলায় সম্ভাব্য সমাধানঃ

- ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন দ্বারা শক্তিশালী জনমত তৈরি
- ধাপে ধাপে নীতি প্রস্তাব করা
- জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঐচ্ছিকভাবে আলাদা লিঙ্গ মডেল যুক্ত করা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ শিফট-ভিত্তিক পৃথকীকরণ
- বিদ্যমান ভবন পুনর্বিন্যাস
- আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিরাপত্তা, শালীনতা, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তুলে ধরা
- আন্তর্জাতিক সফল উদাহরণ দেখানো
- নারী বিশ্ববিদ্যালয়–এর অগ্রগতি মিডিয়াতে তুলে ধরা
- উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা
- পুরুষ শিক্ষককে পর্দা বজায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থায় ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা

- অনলাইন বা ভিডিও লেকচার
- নারী শিক্ষক তৈরির দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যান

ইসলামী শিক্ষার ভবিষ্যত উজ্জ্বল, তবে এটি সফলভাবে উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন। সঠিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন দ্বারা ইসলামী শিক্ষা আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর হতে পারে। এখানে তিনটি প্রধান দিকের সম্ভাবনা তুলে ধরা হলো: ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের উন্নতি, এবং প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহার।
ইসলামী শিক্ষাকে আরও কার্যকরী করতে হলে ধর্মীয় এবং আধুনিক শিক্ষার মধ্যে একটি সুষম সমন্বয় ঘটানো উচিত। কুরআন, হাদিস, এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে থাকা, অন্যদিকে বিজ্ঞানের উন্নত ধারণা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার করা উচিত। পৃথিবীজুড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আধুনিক শিক্ষার মান বজায় রাখতে এবং নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করতে হবে । এতে করে শিক্ষার্থীরা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নত হবে। ইসলামী শিক্ষা শুধু ধর্মীয় পাঠ নয়, বরং এটি একটি গবেষণামূলক এবং উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। মুসলিম বিশ্বের অনেক সমস্যার সমাধান ইসলামী শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী অর্থনীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে অনেক গবেষণা হতে পারে যা মানবতার কল্যাণে কাজে আসবে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত এই ধরনের গবেষণাকে আরও উৎসাহিত করা এবং গবেষণা কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত করা ।
প্রযুক্তি ইসলামী শিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অনলাইন কোর্স এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাকে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। ই-বুক, ভিডিও লেকচার, এবং ডিজিটাল লাইব্রেরির মাধ্যমে কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী দর্শনের জ্ঞান সহজে এবং সুলভে জনগণের কাছে পৌঁছানো যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা আজকাল কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী তাফসির এবং হাদিস শোনার জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করছেন। এতে করে ইসলামী শিক্ষার প্রসার বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
ইসলামী শিক্ষা মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা নৈতিকতা, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং মানবতার সামগ্রিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি করা এবং এক আলোকিত সমাজ গঠন করা। তবে, আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সমাজে ইসলামী শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে হলে সময়োপযোগী সংস্কার ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত

জরুরি। প্রথমত, ইসলামী শিক্ষার সফলতা নির্ভর করছে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের উপর। একটি সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সামাজিক জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত হয়, তা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য আরও কার্যকরী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো কিছু মুসলিম দেশ ইতিমধ্যেই আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার একীভূত পদ্ধতি বাস্তবায়ন করছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা এবং বিজ্ঞান উভয়ের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে, যা তাদের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার যোগ্য করে তুলছে ।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির প্রভাব ইসলামী শিক্ষার প্রসারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ই-বুক, অনলাইন কোর্স এবং ভার্চুয়াল পাঠাগার এখন শিক্ষার্থীদের জন্য সহজলভ্য। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো কেবল ইসলামিক শিক্ষার প্রচারই নয়, বরং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ইসলামের জ্ঞান পুনর্গঠনের একটি সুযোগ তৈরি করেছে। এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার ইসলামী শিক্ষাকে আরও জনপ্রিয় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জনপ্রিয় মোবাইল অ্যাপ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেমন কুরআন মজিদ অ্যাপ, মুজাবা, এবং ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি বিশ্বব্যাপী মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । তৃতীয়ত, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা সম্ভব। ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়গুলো যেমন নৈতিকতা, মানবাধিকার, এবং ন্যায়বিচার, এই দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার মাধ্যমে বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী অর্থনীতি এবং ফিনটেকের মত বিষয়গুলো, যা শারিয়া-সম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগে কেন্দ্রীভূত, বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । চতুর্থত, ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা প্রতিরোধ এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান এবং নৈতিকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা। ইসলামী শিক্ষা যদি তার প্রকৃত সত্তা অনুযায়ী প্রচারিত হয়, তাহলে এটি শুধুমাত্র মুসলিম সমাজ নয়, বরং সমস্ত মানবতার জন্য একটি কল্যাণময় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে।[১০৫]

# উপসংহার

ইসলাম সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। এই মহান দ্বীনের অনুশাসন নারী জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর স্পর্শে এনেছে। আজ সারা বিশ্বে নারী শিক্ষা আন্দোলন জেগে উঠেছে। নারী চায় সমাজে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার। ইসলামও নারীর এই অধিকারকে অস্বীকার করে না বরং স্বাগত জানায়। পুরুষ জাতির পাশে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য নারী জাতি শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে প্রবেশ করে। শিক্ষাঙ্গনে নারীর এই প্রবেশে ইসলাম বাধা দেয়নি।

এখন সারা মুসলিম জাহানে নারী তাদের ন্যায্য অধিকার প্রায় সাবলীলতার সঙ্গে ভোগ করছে। তারা সব রকমের বিদ্যা নিকেতনে সমাজের প্রয়োজনীয় জ্ঞানর্জনে নিয়োজিত আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নারী জাতির যাতায়াত এখন প্রায় অবাধ। নারী এখন শিক্ষিকা, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, নার্স, সমাজসেবী, বৈজ্ঞানিক। নারী এখন তাদের কাজ পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাপন করার জন্য প্রস্তুত, শিক্ষাঙ্গনে নারীর স্বাভাবিক যাতায়াত নিশ্চিত না হলে সমাজের সর্ব প্রকার উন্নতিতে পুরুষকেই হাত লাগাতে হতো, ফলে তার এই প্রচেষ্টা পুরোপুরিভাবে কোনো দিনই সার্থকতা লাভ করতে পারতো না। ইসলামে নারীর এই স্বাধীনতা খর্ব করার নীতি নেই। কিন্তু শালীনতা বিসর্জন দিয়ে সমাজের কাছ থেকে জোর করে তার অধিকার পেতে চাইলে ইসলাম তার এই কাজেই বাধ সাধবে। শালীনতা বিবর্জিত কোনো কাজই ইসলাম অনুমোদন করে না। শিক্ষা অন্বেষণের দোহাই দিয়ে, সম অধিকারের কথা বলে কোনো নারী যদি তার শালীনতা ও সতীত্ব বিসর্জন দেয়, সেটা ইসলামে কিছুতেই অনুমোদিত না। কিন্তু জ্ঞানার্জনকে ইসলাম সবসময়ই সমর্থন করে ।[১০৬]

আমাদের মুসলিম মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা জ্ঞানী-গুণী মা বোনেরা তথাকথিত প্রগতিবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে মোহাবিষ্ট হয়ে শাশ্বত সুন্দর জীবনাদর্শ ইসলামী আইনকে কুসংস্কার ও ইসলামের নির্দেশিত পর্দাকে অবরোধ বলে অবজ্ঞা করে দূরে সরে থাকছেন। তাঁরা বুঝছেন না যে, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই এবং এ জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই আজকে নারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা সাধারণভাবে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। মানব রচিত মতবাদ ও চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক হয়ে কি পেয়েছেন তারা?[১০৭]

বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন মানুষ ইসলাম অনুসারী। অতীতের বিবেচনায় বিদ্যানিকেতনগুলোতে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শতকরা হারে শিক্ষিত জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। মেয়েদের জন্য অনেক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে এটা একটা আশাব্যঞ্জক নিদর্শন, সন্দেহ নাই। এই নিদর্শনের পবিত্রতা রক্ষিত হলে ইসলাম একে স্বাগত জানাবে। তবে পবিত্রতা রক্ষার অপারগতার পরিচয় দিলে ইসলাম একে কোনো দিনই অনুমোদন দিবে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা মাঝে মাঝে এমন কিছু ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি যা ইসলাম কোনভাবেই অনুমোদন করে না। ছেলেমেয়েদের শালীনতা বর্জিত মেলামেশা এমন একটি পর্যায়ে ঠেকেছে যে, শুধু ইসলাম কেন, পরিবর্তনশীল দুনিয়ার কোনো ধর্মই একে অনুমোদন দিবে না। আমরা আশা করি, আমাদের নিরক্ষর জনসমুদ্র দ্রুত নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। তবে ইসলামী অনুশাসন যাতে তার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনার বান নিক্ষেপ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমাদেরকে সতর্কতার সাথে করতে হবে। ইসলামের সাম্য নীতি যাতে কোনো অশালীন প্রক্রিয়ার মাঝে বিলীন হয়ে না যায়, তার ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের এ সত্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।[১০৮]

শরীয়তের অনুমোদিত উপায়ে 'জেন্ডার বৈষম্য' মুক্ত হয়ে মানব সম্পদের এই বৃহৎ অংশ নারী জাতির উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রয়াস ইসলাম গোড়া থেকেই চালিয়ে আসছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও তৎপরতাকে ইসলাম কল্যাণকর মনে করেছে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে নারী সমাজের উন্নয়ন ইসলামের একান্ত কাম্য।

যুগের অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে মুসলিম নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হলে এবং তাদেরকে ব্যভিচার, ধর্ষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে সারা দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মাদ্রাসা ও মহিলাদের জন্য সতন্ত্র সাধারণ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতীব প্রয়োজন, যেগুলো মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে।[১০৯]

আমাদের বিদূষী নারী সমাজের উচিত জ্ঞানের পথে এগিয়ে এসে স্ব স্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করে এবং ইসলামী বিষয়গুলোতে পান্ডিত্য অর্জন করে ইসলামের উন্নয়নের কাজে সর্বোচ্চ খিদমত করা। সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতিতে অবদান রাখা চাই, যা বর্তমান নারী সমাজ ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে পথ দেখাবে ইন শা আল্লাহ।

## রেফারেন্সসমূহ

[১] মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

[২]ইফতেখার সিফাত,আলাপন ব্লগ

[৩] সহীহ বূখারী, হাদিস নং ৪৯৩

[৪] আব্দুল্লাহ আল-মামুন, নারীর ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ পৃষ্ঠাঃ ৭-১২

[৫] সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, পর্দা ও ইসলাম পৃঃ ১৭৪-১৭৫

[৬] ড. মো. আব্দুল কাদের, নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পৃষ্ঠাঃ ৬-৭

[৭]মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরিদাবাদী, নবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, পৃঃ ৭৯-৮১।

[৮] সহীহ বূখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৬৬১ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫০২৭

[৯]  ড. মো. আব্দুল কাদের, নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী পৃষ্ঠাঃ ৯-১১

[১০] বুখারী ও মুসলিম

[১১]আব্দুল্লাহ আল-মামুন, নারীর ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ পৃষ্ঠাঃ ৪-৭

[১২] সহীহ বূখারী, হাদিস নং ৯৭

[১৩] শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৩৪৫৭

[১৪] মাওলানা নো'মান আহমদ, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, ঢাকাঃ শিবলী প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃষ্ঠাঃ ৯৪

[১৫] ইসলামী দৃষ্টীতে নারীঃ একটি সমীক্ষা,ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানু-মার্চ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠাঃ ৫৫

[১৬].মুহাম্মদ কুতুব, ইসলাম ও নারী, পৃষ্ঠাঃ ২২

[১৭] ড. মোঃ আজহার আলী,পৃষ্ঠা ২৬

[১৮] মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, নারী, (ঢাকা, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় সংস্কার ১৯৮৮), পৃষ্ঠাঃ ৫০-৫১

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৫৩

[২০] উ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বানু, সংবিধান ও ধর্মে বাংলাদেশে মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা : একটি পর্যালোচনা, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট পত্রিকা, দ্বাদশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠাঃ ৫৮।

[২১] মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬১।

[২২] ইবন আবদি রাব্বিহি, আল্-ইকদুল ফরীদ, ১ম খণ্ড, কায়রোঃ মাতবাআতু লাজনাতিত্ তা'লীক, ১৯৬৫, পৃষ্ঠাঃ ২৭৬।

[২৩] বুখারি : ৩৩৩১।
[২৪] বুখারি, হাদিস : ৭৩১০।
[২৫] আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৮৭।
[২৬] ইবন সা'দ, আত্-তাবাকাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭।
[২৭] সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৫।
[২৮] বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠাঃ ২০; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, মুসলিম নারীর পোষাক ও কর্ম, ঢাকাঃ এশা রাহনুমা, সাইন্স ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠাঃ ৭২-৭৬।
[২৯] সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান, পৃষ্ঠা ৮৮।
[৩০] দারেমী, সুনান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৮২।
[৩১] হাফিজ যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি., পৃষ্ঠাঃ ২৭।
[৩২] জালালুদ্দীন উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ  ১০৩।
[৩৩] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, আল্ ইসাবা ফী তামীযিস্ সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।
[৩৪] হাকেম, মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
[৩৫] তদেব।
[৩৬] ইবনে ইমাদ হাম্বলী, শাজারাতুয্ যাহাব, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ আল্-মাকতাবাতুত্ তিজারী, তা. বি. পৃ. ১১৪।
[৩৭] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, ১২শ খণ্ড, বৈরুতঃ দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি. পৃ. ১২৯।
[৩৮] হাফিজ যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
[৩৯] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, আল্-ইসাবা ফী তামীযি্ সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।
[৪০] ইবনে আব্দিল বার, আল্ ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাত যায়নাব বিনতে আবূ সালামা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫৫।
[৪১] ইবনে সা'দ, আত্-তাবাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।
[৪২] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, আল্-ইসাবা, প্রাগুক্ত, ৩১৭।
[৪৩] ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত, ২য় খণ্ড, মিশরঃ ইদারাতুত্ তারআতিল মুনীরয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৩৪৯।
[৪৪] বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
[৪৫] ইবন আব্দিল বার, আল ইসতিয়ার ফী আসমাইল আসহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫৫।

[৪৬] ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

[৪৮] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

[৪৯] ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

[৫১] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১০।

[৫২] ইবনুল হাজ্জ, আল্-মাদখাল, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি., পৃ. ২১৫।

[৫৩] তদেব।

[৫৪] মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭৮।

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

[৫৬] মুফতী আমিমূল ইহসান, আসমাউর রিজাল, (ঢাকা, আল বারাকা লাইব্রেরী, ১৯৮৩), পৃ. ২২-২৩।

[৫৭] মুফতী আমিমূল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

[৫৮] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশ'আছ, কিতাবুত তিবিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০।

[৫৯] বালাযুরী, ফতুহুল বুলদান, (কায়রো, ১ম সংস্কার, তা. বি.), পৃ. ৪৭২।

[৬০] আল্লামা শিবলী, সিরাতুন্নবী, (উর্দূ টেক্সট), (আলী গড়, ২য় খণ্ড, ১৩৭৫ হি.), পৃ. ৪০৯।

[৬১] ইমাম মহিউদ্দীন আন্-নববী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৪।

[৬২] Tuta Khalil, The contribution of the Arabs to education, (New York, 1926), P. 79.

[৬৩] মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

[৬৪] ফজলুর রহমান খান, ইসলামে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ, (ঢাকা , ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯২), পৃ. ৮১।

[৬৫] নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর ৬৩ বছর বয়সে ১১ হিজরীতে ১২ রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ৮ই জুন, ৬৩২ খ্রীঃ সোমবার দ্বিপ্রহরে মসজিদে নববীর হুজরায় উম্মূল মু'মিননীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট গৃহে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, (ঢাকা, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লি., ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৬।

[৬৬] ডা. মোঃ আযহার আলী, শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১।

[৬৭] ফজলুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

[৬৮] ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।

[৬৯] মুফতী আমিমূল আহসান, তারিখু ইলমিল হাদীস, (ঢাকা, মুফতি মঞ্জিল, তা. বি.), পৃ. ২১।

[৭০] ইবনে কাইয়ুম জাওজিয়া, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

[৭১] ইবনে হাজার আস কালানী, ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

[৭২] আবুল হাসান আল্-বালাযুরী, ফতহুল বুলদান, (কায়রো, বৈরূত, দারুল মাকতাবাতিল হিলাল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

[৭৩] ফজলুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫।

[৭৪] .আবু আব্দুল্লাহ্ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

[৭৫] .ফজলুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫।

[৭৬] .মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

[৭৭] ইবনুল কাইয়্যেম আল জাওজিয়া, ইলামূল মুয়াককিয়ীন, ১ম খণ্ড, কুর্দঃ মাতবা'আ ফায়জুল্লাহ আল কুর্দী, ১৩২৫ হিঃ, পৃ. ৯-১১।

[৭৮] বুখারী, আল্-আদাবুল মুফরাদ, বৈরুতঃ দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়্যাহ্, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮২।

[৭৯] ইবনু ইমাদ হাম্বলী, শাজারাতুয্ যাহাব, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

[৮০] তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল মানাকিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

[৮১] ইবনে ইমাদ হাম্বলী, শাজারাতুয্ যাহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[৮২] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

[৮৩] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

[৮৪] ইবন আব্দিল বার, আল্-ইসতিয়াব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬; নিয়াম ফতেহপুরী, আস্-সাহাবীয়াত, অনুবাদঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, মহিলা সাহাবী, ঢাকাঃ আল্-ফালাহ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ. ৬৩।

[৮৫] ইবনে সা'দ, আত্-তাবাকাত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; মাওলানা সাঈদ আনসারী ও মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী, হায়াতুস সাহাবীয়াত, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব, মহিলা সাহাবীদের জীবনাদর্শ, ঢাকাঃ নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, চকবাজার, তা. বি. পৃ. ৪৮।

[৮৬] আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ্, তাহরীরুল মারআ ফী আসরির রিসালাহ্, ১ম খণ্ড, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল মুনয়েম, আবুল কালাম পাটওয়ারী ও মাওলানা মুনাওয়ার হোসাইন, ঢাকাঃ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল অব ইসলামিক থট্স, ১৯৯৫, পৃ. ২৬৩।

[৮৭] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

[৮৮] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।
[৮৯] আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; ইবন জারীর আত্-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মূলুক, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; ইবনে হিসাম ,আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।
[৯০] ইবনু কাইয়্যেম আল জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, তা. বি., পৃ. ২২১।
[৯১] ইবনু আব্দুল বার, আল্-ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু রুবাই' বিনতে মু'আওয়ায, ৪র্থ খণ্ড,, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩৭।
[৯২] ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবা, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি., পৃ. ৪৫২।
[৯৩] ইবনু আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪৭।
[৯৪] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।
[৯৫] ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, মিশর: আল্-মাতবা'আতুল আমিরিয়্যাহ্, ১২৮৩ হি., পৃ. ১২৯।
[৯৬] Dr. M. Zubayr Siddiqi, Hadis Literature: Its Origins Development of Special Features, Cambridge : Islamic Texts Society 1993 'হাদীস চর্চায় মহিলা স্কলারদের অবদান' মাসিক আশ্-শাহদাহ্, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪২০ হি., মার্চ ২০০০ইং।
[৯৭] ড. মোঃ আযহার আলী, শিক্ষার ইতিহাস, পৃ. ২১২।
[৯৮] মোসাম্মত কবিতা সুলতানা, ধন্য আমি নারী, ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৭৫-৮০।
[৯৯] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৮৩৩]
[১০০] আফগানিস্তানে নারী শিক্ষা: পশ্চিমাদের প্রোপাগাণ্ডা বনাম বাস্তবতা » মধ্যপ্রাচ্য
[১০১] শাইখ আব্দুর রাজ্জাক ইবন আব্দুল মুহসীন আল-বদর, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
[১০২] মাওলানা আতাউর রহমান কাসেমী, উৎকৃষ্ট নারী জীবন ও পর্দাতত্ত্ব, ঢাকাঃ আজিজিয়া কুতুবখানা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৩৪-৩৬।]
[১০৩] ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নারী শিক্ষা, মাসিক আত-তাহরীক]
[১০৪]আব্দুল্লাহ আল-মামুন, নারীর ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ]
[১০৫]https://bangla.islamonweb.net/The-plight-of-Islamic-studies-in-madrasas:-Challenges-and-possible-solutions
[১০৬] ড. মোঃ আযহার আলী, শিক্ষার ইতিহাস,  পৃ. ২১২।

[১০৭] প্রিন্সিপাল মাওলানা আকবর হোসেন, বেগম নূরজাহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

[১০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

[১০৯] প্রিন্সিপাল মাওলানা আকবর হোসেন, বেগম নূরজাহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।